স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প

কণা বসু মিশ্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মলাটের শেষে	১১
সম্বুদ্ধ	২০
তুলির কিছু সময়	৩৪
সোনিয়া	৪৪
মাতৃত্ব	৫৪
আজকাল	৬০
টুকাই	৬৯
মানু, কাজল ও আর কয়েকজন	৭৪
ঊর্মি	৮৪
ঠাকরুণ	৯২
রমলাদের বসার ঘরে	৯৯
তোমার ঠিকানায়	১০৫
অমৃতার অমৃত লাভ	১১০
সায়ক	১১৬
সেদিন যখন	১২৭
এই প্রজন্ম	১৩৩
আমেরিকার প্ল্যাটফর্মে	১৩৮
হিমাদ্রিশঙ্কর নিরুদ্দেশ	১৫৩
প্রতিবাদ	১৫৯
রিনির প্রেম	১৬৬
দীপদ্যুতি অথবা ওরা	১৭৩
সৌরভী আর আবিরের গল্প	১৮৫
ওরা দুজন	১৮৯

ঐন্দ্রিলা	১৯৯
ম্যালে সেই নন্দিনী	২০৬
দখল	২১৭
বন্ধ দরজা	২৩৩
শালিনী	২৪১
প্ল্যাটফরমের পুরোনো বউ	২৪৬
যদিও সোহিনী	২৫৩
ওদের বিলাস	২৬৮
সুজিতা	২৭৪
লকেট	২৮১
নীলাঞ্জনা	২৮৯
অবন্তীর দুপুর	২৯৫
ভেড়ির সেই মেয়েটা	৩০০
অলীনা মাসিমা	৩১০
শেষ পর্যন্ত	৩১৬
লক্ষ্মীর অলক্ষ্মী	৩২০
নতুন ফ্ল্যাটের নবমিতা	৩২৪
চেনা ফুলটুসি	৩৩০
ছাঁচের বাইরে	৩৩৫
নারদ মুনি	৩৪১
টেক্কা টেক্কি	৩৪৫
বুড়ো কেরানিবাবু	৩৫২
পরাজিত বিনতা	৩৫৮
চলমান	৩৬৩
গ্রিলের ভেতর	৩৬৯
চলতি ছবি	৩৭৫
এখন মৈত্রেয়ী	৩৭৯

মলাটের শেষে

গেটের পাশে ইউক্যালিপটাস গাছটার বনেদি পাতার আড়ালে লাট খাচ্ছিল ফুরিয়ে আসা বিকেলের মরা আলোটা। বিশ্বচরাচর জুড়ে পাখ-পাখালির ডাক। গেট খুলে ভেতরে ঢুকল নৈঋতা। মাথাটা উঁচু করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, দোতলার কাচের জানলার পাল্লাদুটো খোলা আছে কি না? কেউ কী দেখছে তাকে? যদিও কোনো মুখ ভেসে ওঠার কথা নয়। তবু পুরোনো অভ্যেসটা ওকে নাড়া দিল। ইউক্যালিপটাসের কয়েকটা পাতা হাওয়ায় উড়ে গেল। সারাদিনের প্রচণ্ড দাবদাহের পর হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার পাগলামি।

মা আয়াকে বলতেন, আমার হুইল চেয়ারটা জানলার কাছে ঘুরিয়ে দাও তো। এই সময় ঋতু আসে কিনা?

কপালের ওপরকার উড়ে পড়া চুলগুলো সমান করতে করতে নৈঋতা একটু অন্যমনস্ক হল। ও একটা ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে দরজার বেলটা জোরে টিপল। বুড়ি আয়া দরজাটা খুলে দিল। ঘরভরা একবুক শূন্যতা ঠা ঠা করে উঠল। মা নেই, কিন্তু আয়া আছে। কদিন পর ওরই ছুটি হয়ে যাবে। নিঃস্বের মতো দাঁড়িয়েছিল হুইল চেয়ারটা। মায়ের ওয়াকারটা হেলান দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা ছিল দেওয়ালের সঙ্গে। আর ফরমাশ মাফিক বিশেষ ধরনের তৈরি মায়ের পায়ের নরম চামড়ার জুতোটাও।

ছোট্ট ত্রিকোণ টেবিলটার ওপরে স্নেহলতার হাসিমাখা একটি ছবি স্টিলফ্রেমে আটকানো ছিল। সেই ছবির সামনে নতুন চশমাদুটো। মেরুন রঙের খাপের মধ্যে দূরের চশমা। ঘি-রঙের খাপের মধ্যে কাছের চশমা। এই চশমাজোড়া মায়ের শেষের দিনের সঙ্গী ছিল। কিন্তু মাত্র দিনদুয়েক ব্যবহারের সুযোগ হয়েছিল ওঁর।

স্নেহলতা প্রায়ই বলতেন, হ্যাঁ রে ঋতু। এখন দিন না রাত?

—কেন মা? এখন তো বিকেল।

—বিকেলের রোদ্দুর কী ফুরিয়ে গেছে?

—কই না তো? এখন তো বেশ আলো রয়েছে।

—আমি কেন ঝাপসা অন্ধকার দেখি বলত?

—তোমার বোধহয় চশমার পাওয়ারটা বেড়েছে। আচ্ছা, শেষ কবে তোমার চশমা বদল হয়েছিল বলত?

সে অনেকদিন। ওই তো সেবার দার্জিলিঙে মামণি আর গৌরব কত বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে ছানি কাটিয়ে চশমা করেদিল। তারপর থেকে তো আর দরকারও হয়নি।

স্নেহলতা একটু হেসে বললেন, ওই চশমা পরেই তো এত বছর ধরে কত কী দেখলুম। কত মানুষ, কত দেশ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র। হৃষিকেশ থেকে বদরীনাথ, ওদিকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রটাই তো মুখস্থ হয়ে গেল। এখনই সব গোলমাল।

—আচ্ছা মা, তোমার চোখটা দেখিয়ে দেব। চোখের ডাক্তার সুনীল ঘোষকে দেখাতে হলে তো

দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে হবে। কে তোমায় গাড়ি থেকে নামিয়ে ওপরে তুলবে? এই বুড়ি আয়াটা তো পারবে না। আয়া হিসেবে রীণা খুব স্মার্ট ছিল, তাই না মা?

স্নেহলতা সস্নেহে হাসলেন। —হ্যাঁ, রীণা আমায় ছাদে তুলে নিয়ে হুইল চেয়ারে বসিয়ে সারা ছাদ ঘোরাত। ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে চাঁপা ফুলের গাছটায় কী ফুলই না ফুটত! হ্যাঁরে ঋতু। গাছটা কী এখন তেমনই আছে? রীণা চেঁচিয়ে বলত, ওই দেখুন মা, ওই দেখুন টিয়াপাখি উড়ে গেল। আমি দেখতুম ঘন সবুজ পাতার আড়ালে কচি কলাপাতা রঙের টিয়াপাখি। তার টুকটুকে লাল ঠোঁটদুটো যেন শিউলি ফুলের লাল বোঁটা।

—তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকতে, না মা?

—ওই আঁকতুম। —স্নেহলতার চোখদুটো হারিয়ে গেল, জানলার কাচের পাল্লার বাইরে নীল আকাশের গায়ে, যেখানে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। হাওয়ায় ওলট-পালট খাচ্ছিল গাছ-গাছালির মাথা। স্নেহলতা আস্তে আস্তে বললেন, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে টিলার ওপর একটা বাংলো করেছিলেন বাবা। রোববারে মক্কেলের ভিড় বন্ধ রেখে আমাদের নিয়ে যেতেন সেখানে। টিলার ঘাসের ওপর বসে আমি ছবি আঁকতুম। সবুজ মখমলের মতো ঘাস। ঘাসফড়িংগুলো যখন উড়ে উড়ে এসে বসত, তখন কী সুন্দর যে লাগত! নদীর পাড়ে মাছরাঙা পাখি আর বকের মিছিল। ওরা ঠুকরে ঠুকরে মাছ খেত। টলটলে জলে ঝাঁক ঝাঁক ছোটো মাছের সারি। ওদিকে নৌকোর মাঝিরা গুণ টেনে যেত : বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। স্টিমারের ভোঁ শোনা যেত। ব্রহ্মপুত্রে স্নান সেরে হিন্দুস্থানী স্বামী-স্ত্রী তাদের হলুদ রঙে ছোপানো ভিজে কাপড় চাঁদোয়ার মতো লম্বালম্বিভাবে মাথার ওপর ধরে দেশোয়ালি গান গাইতে গাইতে যেত নদীর পাড় দিয়ে। তাদের পরনের কাপড়ও ছিল হলুদ। সেই রঙিন মানুষগুলো, হরিয়াল পাখি, মাছরাঙা, বক আর ফড়িং আমার পাহাড়, নদীর স্বপ্নময় তুলিতে ছবির পর ছবি হয়ে যেত। স্টিমারের সারেং কম্পাসের কাঁটায় দিক ঠিক করত। খালাসিরা নমাজ পড়ত, তাও দেখতুম। জানিস! শীতকালে পাহাড়ের মাথায় বাঘ বসে থাকত?

স্নেহলতার মুখে ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল। বললেন, হলদে হলদে ডোরাকাটা বাঘ-মা বাচ্চাদের আগলে বুকে জড়িয়ে শীতের রোদ পোয়াত টাইগার হিলের সবচেয়ে উঁচু পাথরটার ওপর বসে। ঠিক যেন ছবি। আমার আঁকার খাতাটা ভরে যেত, তুলির আঁচড়ে। কিন্তু কিছুতেই যেন আমার আঁকা ছবিগুলো মনের মতো হত না। স্নেহলতা কথা বলতে বলতে ফের হারিয়ে যেতেন। ওঁর উদাসীন চোখদুটো বৃদ্ধ স্নেহলতার মধ্যে শৈশবের ছোট্ট স্নেহলতাকে যেন খুঁজে বেড়াত।

ঋতু বলল, তোমার কী আবার ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে মা? যদি চশমাটা বদলে দেওয়া যায়?

—করে। কুরুশ দিয়ে সুতোর ডিজাইন তুলতেও ইচ্ছে করে কিংবা কার্পেটের গায়ে ফুল, জীবজন্তু, প্রকৃতি। সবই তো ছবি। —স্নেহলতা একটু ইতস্তত করে বললেন, তবে সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করে লিখতে।

—কী লিখতে ইচ্ছে করে?

—এই ডায়েরির পাতার দুচার কথা। আমাদের সেকালটা এখনও যে মনের মধ্যে উঁকি মারে। কিছুই তো হারায় না। একালের প্ল্যাটফর্মে বসে সেকালের স্মৃতির পাতা উলটে যাই। জানিস! আমাদের তেজপুরের বাড়িতে প্রতি রোববার থিয়োসফিকাল সোসাইটির মিটিং হত। আমার বাবার অসমিয়া, বাঙালি উকিল বন্ধুরা সবাই আসতেন। আমার দাদারা অর্গান বাজিয়ে গান করতেন। মেয়েদের তো তখন বাইরের ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল। আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতুম মিটিংয়ের কথাবার্তা। আমি তখন স্কুলে পড়তুম। মিটিং ভেঙে গেলে অর্গান বাজিয়ে আমিও গাইতুম, ব্রহ্মসংগীত।—

পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণ মঙ্গল রূপে হৃদয়ে এসো, এসো মনোরঞ্জন।

আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ—

স্নেহলতা একটু থামলেন। তারপর বললেন, বাবার আলমারি ভরা কত বই! সেইসময় আমি অ্যানি বেসান্তের বই, আরও কয়েকটা বই পড়েছিলুম। আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে ইচ্ছে করত।

নৈঋতা অপলকে তাকিয়ে থাকল মায়ের ছবির দিকে। এখন আর জোর করে মায়ের মুখে মিষ্টি গুঁজে দিতে হয় না ওকে। তার বদলে ওঁর গলায় পরিয়ে দেয়, রজনীগন্ধার মালা। আজও দিল। নৈঋতা বিড়বিড় করে বলল, মা! তুমিও শেষপর্যন্ত ছবি হয়ে গেলে?

ছবির মায়ের চোখে সেই অপত্য স্নেহ ঝরে পড়ল। নৈঋতা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল, হ্যাঁ রে ঋতু। তুই যে বলেছিলি আমায় অ্যালবাম দিবি? কোর্টে যাবার সময় আমার বাবার গায়ে কালো গাউন চাপানো ছবিটা, কোথায় গেল রে? হুডখোলা গাড়িতে চেপে বাবা-মায়ের সঙ্গে আমরা বেড়াতে যেতুম।

একটু দম নিয়ে স্নেহলতা বললেন, ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে অবজারভেটর হিল হয়ে ভোমড়াগুড়ির দিকে। তোর ন মামা, ছোটোমামা, মনামামা সবাই তখন ছোটো। তোর বড়োমামা, মেজোমামাই যা বড়ো ছিলেন। সেইসব দিনের ছবিগুলোও তো অ্যালবামে রয়েছে না রে? কত বছর আগের সব কথা। হ্যাঁ রে! ছবিগুলো তেমনই স্পষ্ট আছে তো? পোকায় কেটে ফেলেনি? সোনাজুলি, বড়োজুলি, তারা-জুলি, চোলকোপা কত চা-বাগানেই না বেড়াতে যেতুম আমরা, বাবা-মায়ের সঙ্গে। চা-বাগানের ম্যানেজাররা তো বাবার মক্কেল ছিলেন, তাঁরাই নিমন্ত্রণ করতেন। তখন তো সব সাহেবের রাজত্ব চলছে। দেখতুম, কুলিদের কী কষ্ট! ওরা বাগানে পাতা তুলতে তুলতে নুন চা খেত, চায়ের লিকার। কুলি মেয়েরা পিঠে বাচ্চা বেঁধে ঝড়, জল, রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনভর পাতা তুলত। একটু এদিক-ওদিক হলেই কলঘর থেকে বেরিয়ে আসে মাইতিবাবু, মোটাবাবু। পিঠে পড়ত তাদের বেত। ওরা আসত সুদূর সাঁওতাল পরগনা থেকে। কেউ ছোটোনাগপুরের মালভূমি, কেউ বিহার, কেউ ওড়িশা, কেউ যা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে। জানিস! আড়িকাঠিরা এইসব কুলিদের ধরে ধরে আনত। একজোড়া কুলি ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা। অশিক্ষিত গরিব মানুষদের ভালো খেতে-পরতে দেবার এবং ভালো মাইনের লোভ দেখিয়ে তাদের স্টিমার ভরতি করে চালান করা হত। আড়কাঠিদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দু-দলই ছিল। মেয়ে আড়কাঠিরা কী করে ভোলোাত জানিস? তারা পরম আত্মীয়ের মতো পান-সুপুরি চিবোতে-চিবোতে সরল গ্রাম্য আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে মিশে যেত। তাদের জন্যে এটা-ওটা উপহার। তাদের বাচ্চাদের কোলে করে আদর করে এটা-ওটা খাবার দিত। তারপর ওই বাচ্চারা যাতে সুখে থাকে, সেই লোভেই ঘর থেকে মেয়েদের বের করে স্টিমারে পাচার করে দিত ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। চা-বাগানে এনে একবার ফেলতে পারলেই হল। কথায় কথায় বেত। চা-বাগানের সাহেবদের অত্যাচার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেত।

নৈঋতা অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বলল, দাদু ওই চা-বাগানের সাহেবদের মামলা নিতেন কেন?

—ও বাবা! সে তো নিতেই হবে। ওকালতিটা ব্যাবসা ছাড়া তো কিছু নয়। তবে আমিও বাবাকে ওই কথাই বলতুম। আজ যেমন তুই বললি?

নৈঋতা বলল, আচ্ছা মা! হুডখোলা গাড়িতে শীতকালে চা-বাগানে কী করে যেতে তোমরা? বাঘের ভয় ছিল না?

স্নেহলতা হেসে উঠলেন, ওমা! তাতো থাকবেই। শীতকালে চা-বাগানে হুডখোলা গাড়িতে কী যাবার উপায় ছিল? যেমন ভয়ানক শীত, তেমনই বাঘের উপদ্রব। আমরা যেতুম মাথা ঢাকা বড়ো বুইক গাড়িটায় চড়ে। বাবার সঙ্গে তাও বন্দুক থাকত, আমার বাবা তো ভালো শিকারি ছিলেন। বাবার শোবার ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড হরিণের মাথাটা দেখিসনি? অবশ্য বাঘ মারেননি কখনও। কিন্তু জেঠামশাই মেরেছিলেন। তোর বড়োমামার তোলা সব ছবিগুলোই তো রয়েছে অ্যালবামে। নিয়ে আসবি ঋতু?

চা-বাগানের শেডট্রির নীচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বাবা-মায়ের সঙ্গে। পেছনে কুলিমেয়েরা পাতা তুলছে।

নৈঋতা বলল, আচ্ছা, মা! আমার বাবার ছবিগুলো তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

স্নেহলতার ঠোঁটে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলেই মিলিয়ে গেল, ওঁর উদাসীন চাউনিটা মিশে গেল ভাসমান মেঘের মধ্যে। আস্তে আস্তে উনি যেন কবেকার কোন্ ডায়েরির পেছনের পাতা উলটে চলেছেন, মনে কী পড়ে না? তোর বাবা যখন কোর্টে যেতেন ওঁকে যে আমাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে হত রে!

নৈঋতার মনে পড়ল, ঠিক তাই। আর কেউ বাবার জামা,প্যান্ট, জুতো, কোট, এগিয়ে দিলে পছন্দই হত না ওঁর। নৈঋতারা ছোটোবেলায় দেখেছে, মা যেদিন মামাবাড়ি যেতেন, সেদিন বাবার মেজাজ গরম। কাজের লোকজন তটস্থ। বাবার হাতের কাছে সবকিছু এগিয়ে দিলেও রেহাই নেই। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। একটু থেমে স্নেহলতা বলতে লাগলেন, একদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম। সময়মতো দেখিনি, সেদিন ওই নতুন নাগা চাকর ওয়াইম্যান সব গুছিয়ে দিল।

নৈঋতা বলল, বাবা রেগে যাননি?

স্নেহলতা বললেন, রাগলেই বা উপায় কী? অতবড়ো বাড়িভরা লোকজন। ঘরে ঘরে পড়ুয়া। রাধুনি সুধা একা হিমসিম খাচ্ছে। নির্মলের মা মশলা বেটে, মাছটাছ কেটে দিয়েছে, তবু সুধা চেঁচামেচি করছে। সুধা তো যশোর জেলার লোক ছিল? তাই যশুরে টানে সে বলত, 'মহা মুস্কিলি পড়িছি। ও মামিমা! অমুক ইডা খায় না, তমুক সিডা খায় না। এট্টু দেখায় দেলেন না?'

স্নেহলতা হেসে বললেন, সুধার মন আমায় রাখতেই হত। নইলে সে কথায় কথায় বলত, 'লোক দেখেন। আমি চলে যাবানে।' ...অনেক বছরের পুরোনো লোক তো সুধা? একেবারেই আপন লোকের মতো বাড়ি আগলাতো। মনে পড়ে? খুব ভালোবাসত তোদের?

নৈঋতার মনে পড়ল, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সুধাদিদি ছোট্ট হামানদিস্তায় পান ছেঁচতো। সুপুরি, খয়ের, চুনে, পানে মিশে মিহি হয়ে যেত। বাটা মশলার মতো পানটা। সুধাদিদি দাঁতহীন ফোকলা মাড়ির ফাঁকে জিভের ভেতর পানটা ফেলে দিয়ে দুপা ছড়িয়ে নভেল পড়ত। কতদিন রান্না পুড়ে যেত। কিন্তু ওর হুঁশ নেই। তখন মাকে বাধ্য হয়েই রান্নাঘরে ছুটতে হত। যদিও স্নেহলতা প্রতিটি কাজের লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। শীতে কারো গায়ে কম্বল নেই, কারো মাথার বালিশ নেই, উনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন। কাজের লোকেদের জ্বরটর হলে উনি নিজে তাদের পথ্য তৈরি করে যত্ন করে খাওয়াতেন। থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখতেন। মাথা ধুয়ে দিতেন। নিয়ম করে ওষুধ খাওয়াতেন। নৈঋতার বাবা কোর্টে চলে গেলে, উনি চাকরকে দিয়ে পাশের লেক থেকে গাদা গাদা পদ্মফুলের পাতা তোলাতেন। বড়ো বড়ো কড়াই, হাঁড়ি ভরে রান্না করত সুধাদিদি। নৈঋতার মা ভেতরের বিশাল পাকা উঠোনে লাইন করে বসিয়ে কাঙালি ভোজ করাতেন প্রায়ই। তারা ছিল ভিখিরির দল, জমাদার, জমাদারনি এরাই সব।

বাবা যেদিন মামলার কাজে বাইরে যেতেন, সেদিন যেন স্বাধীন ভারত, সুধাদিদির কাছে বসে ছোটোরা সন্ধেবেলা শুনত ভূতের গল্প। যদি বর্ষাকাল কিংবা বর্ষার রাত হত, তবে তো কথাই নেই। সুধাদিদির ভূতের গল্পের একটি লাইন এখনও মনে আছে নৈঋতার। ''ধনচে গাছটি নড়ে-চড়ে আমার চিলমা যেন এসে উড়ে পড়ে।' যে চিলমা ভূত হয়ে উড়ে বেড়ায়। সেই অবিশ্বাস্য গল্পটা ফাঁদতে গিয়ে সুধাদিদির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যেত। তার একমাথা পাকা চুল, ফোকলা গালে, জিভে জড়িয়ে যাওয়া কথা, হাত নেড়ে বলার ভঙ্গিতে নৈঋতাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। সুধাদিদি পান খাওয়া লাল ছোপের হাসি হেসে বলত, ভয় কী? আমি তো আছি...।

এখন অন্যমনস্ক নৈঋতা বলল, মা। তারপর? তারপর কী হল? বাবার গল্পটা শেষ করবে না?

স্নেহলতা বললেন, তোর বাবা সেদিন কী কাণ্ড করেছিলেন জানিস? উনি খালি গায়েই কালোকোট পরে কোর্টে চলে গিয়েছিলেন, কোর্টের বোতামগুলোও আবার লাগাতে ভুলে গেছেন। তার ওপরে শামলা চাপিয়েছেন, তো সেই কালো গাউনের ফিতের ফাঁসটাই যা খানিকটা ইজ্জত বাঁচিয়ে রেখেছিল। জজকোর্টে মামলা ছিল। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামিকে যখন উনি জেরা করার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন ওঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন জজ। হেসে ফেললেন তারপর। বিপরীত পক্ষের উকিলও মজা পেয়ে বললেন,—আজ বুঝি তোমার মিসেস জামা, জুতো পরিয়ে দেননি?

আদালতসুদ্ধ হেসে উঠল। নৈঋতা বলল, ভারি ইয়ে তো...। এইভাবে কেউ অপদস্ত করে?

স্নেহলতা বললেন, আরে সেই উকিল তো সুধাকান্তবাবু। তোর বাবার দারুণ বন্ধু। সম্পর্কটা ছিল আদালতের বাইরে। আদালত চত্বরে ঢোকার পরে নয়। তারপর কী হল শোনো। সুধাকান্তবাবু বললেন, গায়ে গেঞ্জি নেই, জামা নেই। কোর্টের বোতামটাও লাগাতে ভুলে গেছ? মামলায় হারবার ভয়ে?

নৈঋতা বলল, যাই বলো, এভাবে অপমান বন্ধু কী কখনও করে?

স্নেহলতা বললেন, কোর্ট এমন একটা জায়গা উকিলে উকিলে এসব হয় রে। তোর বাবাও কী চুপ করে থাকার পাত্র? উনিও হেসে বললেন, আমার সঙ্গে মামলায় কী কোনোদিন জিততে পেরেছো . সুধাকান্ত?

আর আশ্চর্য। সেদিনের মামলাতেও তোর বাবাই জিতে গেলেন। অসহায় বিধবার জমি ঠকিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সুধাকান্তবাবুর মক্কেলকেই জেলে যেতে হল। পরদিন মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়ে সুধাকান্তবাবু এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। মর্নিংওয়াক সেরে তোর বাবাও ফিরেছেন সবে। দরজার কড়া নড়ে উঠল। ওয়াইম্যান দরজা খুলে দিল।

সুধাকান্তবাবুকে দেখেই তোর বাবা হা হা করে হেসে উঠেছিলেন, কী হে সুধাকান্ত! এই সাত-সকালেই হাজির? কোনো ধান্দায় এসেছো বলত?

সুধাকান্তবাবু বললেন, তোমার গিন্নিকে বলতে এসেছি, তাঁর কত্তাটির দিকে নজর দিতে।

স্নেহলতা হাসতে হাসতে বললেন, তারপর চায়ের টেবিলে বসে সুধাকান্তবাবু রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্পটা আমায় শোনালেন। শুনে তো আমি হেসে বাঁচিনে। মনে হল, ওঁর কী দোষ? আমিই তো দেখিনি ওঁকে।

নৈঋতার মনে পড়েছিল, বাবা ওর মাকে পড়াশুনোরও সঙ্গী হিসেবে চাইতেন। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা সব সাহিত্যের ওপরেই বাবার ছিল প্রচুর দখল। ছুটির দিনে, কোনো-কোনোদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ ওরা শুনতে পেত, জলদ গম্ভীর স্বরে বাবা মেঘদূত পড়ে শোনাচ্ছেন মাকে। কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব বাবার গলায় কী যে সুন্দর লাগত! স্কুল থেকে ফিরে সামান্য খেলাধুলো করে যে যার জায়গায় পড়তে বসার আগে ওদের বসতে হত প্রার্থনায়। মা অর্গানের রিড টিপে গাইতেন কঠ উপনিষদের সেই বিখ্যাত লাইন। বাবার গলায় সুর ছিল না। গম্ভীর গলায় সেই মন্ত্রই উনি আওড়ে যেতেন। মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে নৈঋতারাও উচ্চারণ করত,

ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্ত, সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বিনাবধীতমস্ত, মা বিদ্বিষাবহৈ।।...

আত্মভোলো বাবার কথা ঘুরে-ফিরেই নৈঋতার মনের স্লেটে ভেসে উঠছিল। স্যার আশুতোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন উনি। পড়া আর পড়ানো দুটোই ছিল ওঁর নেশা। প্রতি রোববার বাড়িতে ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাশ বসত। দাদাদের বন্ধুবান্ধব, কলেজের কত ছাত্র-ছাত্রীরা, গরিবদের প্রাধান্য ছিল সবার আগে। উনি তার জন্যে কোনো পয়সা নিতেন না। বরং সেইসব পড়ুয়াদের নেমন্তন্ন থাকত সকালের